সপ্তম অধ্যায়

অসমের বাংলা কবিতায় প্রেম

অসম বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, বস্তুত সাহিত্যের অন্যতম মূল উপাদান প্রেম, অবশ্য শুধু সাহিত্যেরই বা বলি কেন, প্রকৃতপক্ষে মানব সভ্যতার ভিতটাই তো প্রেমের ওপর গড়া। আর তাই দেশভাগ,[১] উদ্বাস্তু চেতনা,[২] ভাষা আন্দোলন,[৩] স্থানিকতা[৪] সব কিছুর উপরে অসমের বাঙালি কবিদের প্রেম যেন এক চলমান জীবনস্রোত।

'বাড়ি ফিরে তুমি কার সাথে কথা বলো
চোখ তুলে কাকে দেখাও অসীম ইচ্ছের দহন
কাকে দিতে চাও অকারণ বৃষ্টিপাত
হাতভরা সুখের সন্ধান...'

(আমাকে এভাবে ভাবো, পৃ. ৭)

এই কবিতার নাম 'আমাকে এভাবে ভাবো',[৫] লিখেছেন দীপিকা বিশ্বাস,[৬] আবার শক্তিপদ ব্রহ্মচারী[৭] লিখেছেন—

'যে মেয়েটি রোজ আসত তোর কাছে এখন কোথায়
তার বিয়ে হয়ে গেছে? ভালো ঘর, ভালো বর
জানিস তো ঠিক'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৫)

এভাবেই বরাক-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা নির্বিশেষে কবিদের কলমে প্রেম খেলা করেছে বিভিন্ন অনুষঙ্গে।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীকে[৮] দশকওয়ারি বিশ্লেষণে নব্বইয়ে রাখতে হবে। তাঁর একমাত্র কবিতাবই 'তরঙ্গতাড়িত'[৯] প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ সালে। তিনি সম্পাদনা করেছেন 'মহাবাহু'[১০] পত্রিকা। অসমিয়া-বাঙালি সম্পর্ক নিয়ে যাঁবা লেখালিখি করছেন বা করেছেন তিনি সেই তালিকার উপরের দিকে থাকবেন। এবং তিনি হচ্ছেন বহির্বিশ্বের কাছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাঙালি মুখ।

কবির প্রায় প্রত্যেক কবিতায় জড়িয়ে থাকে স্থানিকতা, মৃত্যু চেতনা, তাঁর অতীত এবং তার সঙ্গে প্রেম। তাঁর কবিতায় প্রেমটা ঠিক উৎকট যৌনতা বা খেলো হয়ে আসে না। পাশাপাশি থেকে যায় হয় মৃত্যুর

হাতছানি অর্থাৎ পরিণতি বয়সের প্রেম নয়তো তার অতীত বা স্থানিকতার সঙ্গে প্রেমের মিশ্রণ। কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কুয়াশালিপি'র[১১] প্রথম কবিতায় লেখেন—

'গানের ওপারে থাকে শুধু গান।
আর কিছু থাকে না তো নিবিড় ভালোবাসায়।
মৃত্যুর ওপারে যেমন মৃত্যুই শুধু।

যেকোনো মুহূর্তে খসে যেতে পারে প্ল্যাকটার্ম,
প্রিয় মৃত্যুটি অপেক্ষা করে কাছেই, চুপচাপ,
তোমাকেই আঁকড়ে ধরি আরও
আরও ঘন হই তোমারেই শ্বাসে
প্রতিটি মুহূর্ত তোমাতেই বাঁচি, অনুপম।

ওই যে দেখা হয়েছিল কাব্যপাঠের আসরে
নিপাট উত্তর পূর্বের মিস্টিক সাজে,
সাজ তো নয়, তোমার গভীর টান।

যে টানে ডুবে গিটার,
প্ল্যাকটার্মটি অবিকল ধরা থাকে আঙুলের ফাঁকে
ডুবে যাওয়া গিটারের সমস্ত সুর
মিশে যায় প্রবাহিত জলে'

(কুয়াশালিপি, পৃ. ৯)

এবার কবি দেন পাহাড়ে। কারণ এই নীল পাহাড়টা তাঁর নিজের অত্যন্ত আপন। এক্ষেত্রে আমাদের বুকে নিতে অসুবিধা হয় না যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পাহাড় ঘেরা। এখানেই কবি আবার স্থানিকতায় ফিরে আসেন।

'এবার পাহাড়ে ডুব দিই, নীল পাহাড় আমার
হেঁটে হেঁটে কেমন চলে গেছে দ্যাখো, সীমানার ওপার
ওপারে ইগল সৌথান, তার কমলালেবু গাল
গাল হাসে পাহাড়ের সহজ সরল নিটোল

খাসি মেয়েটির রবীন্দ্রসংগীত যেন।

সবই তোমার, বাকি থাকা পল অনুপল

তোমার গানেই তো আমার কাঙিক্ষত মরণ!'

(তদেব, পৃ. ৯)

এবার কবি বলছেন সব গানেই তাঁর কাঙিক্ষত মরণ থাকে। থাকে রাতের এসএমএস। এবং কবি খুব সুন্দরভাবে এবার এগিয়ে যান এই বলে—

'একথা একাকী জানে গীতবিতান

জানে প্ল্যাকটার্ম, জানে দ্রবীভূত গিটার

জানে ফাগুন হাওয়া, জানে শিশিরের টুপটাপ

জানে শুভমিতা, জানে টোয়েন্টি মিনিট ফোন কল।

এই হৃদয় তোমারই সুরে ডুবে যাক

যে সুর তোমার নিটোল হাতের পরমান্ন

যে সুর হাত ধরাধরি করে কাজিরঙায় রাত্রিভ্রমণ

যে সুর অসুখের শিয়রে কপালে শীতল হাত

যে সুর হঠাৎ দুপুরে দূরভাষে এমনি আলাপ

পাশে থাকা নয় শুধু

ঘন হও আরও

এতই ঘন

মৃত্যুও যেন থাকে অপেক্ষায়।'

(তদেব, পৃ. ১০)

এই কবিতায় কবি খাসি মেয়েটির গলায় রবীন্দ্রসংগীত শুনে অবশ্যই মুগ্ধ হয়েছেন। রবীন্দসংগীতটা তাঁর অত্যন্ত আপন প্রাণের কাছাকাছি। পাশাপাশি খাসি মেয়ের গাওয়াটা কবির প্রাণকে ভরিয়ে তুলেছে। বস্তুত একটি পাহাড়িয়া মেয়ের গলায় তাঁর অত্যন্ত আপন রবীন্দ্রনাথ যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'সরস্বতী পুজোর মেয়ে'[১২] কবিতাতে কবি মৃত্যু চেতনার সঙ্গে প্রেমকে যেন একাকার করে ফেলেছেন। একথা সবাই যানে যে সরস্বতী পুজো বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে,[১৩] আর শুধু বাঙালিই বা বলবো কেন পুরো অসমেই এই দিনটায় প্রেমিক প্রেমিকার খুল্লম খুল্লা পেয়ারের দিন। আর ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া হওয়ায় তো এখন কাছাকাছি না থাকলেও একজন আরেকজনের স্পর্শ না পেলেও স্কাইপে কিংবা ভিডিও কলে একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে। এবং অবাধগতিতে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে কবির সরস্বতী পুজোর মেয়ে কিন্তু ডিজিটাল ইন্ডিয়ার মেয়ে নয় সে নিতান্তই সহজ-সরল সলজ্জ প্রেমিকা। তাইতো কবি

লেখেন—

'এই একটি দিন আমি এলোমেলো
এই একটি দিন, চোখের গরল, ঢালো
নিজ হাতে সাজিয়েছি শরীরের পশরা যত
আজ তছনছ হব, শরীর ভরে নেব দৃষ্টিক্ষত
কোমরে রেখেছি ঘামজলে নদীর তীব্র বাঁক
পাড় ভাঙুক তোমার, সব পুড়ে হয়ে যাক খাক
নিজ হাতে খোলো, আবরণ আভরণ, লজ্জা সকল
গ্রহণে কোনো চারুকলা নেই দানই তুমুল আত্মসমর্পণ' (তদেব, পৃ. ১৭)

কবি প্রেমিকার সঙ্গে যেতে চান মৃত্যুর শয়নে। তাই কবি বলে ওঠেন—

'হারাই চলো, এক মহামরণযানে
অস্তাচলে যাব সহমরণে
সঙ্গী হবে না, শেষ দহনে?
এই নাও তাহলে,
পিঠ রেখেছি খোলা, বেহিসেবি
তোমার চোখের আলোর শিসের অবাধ্যতায়
কলঙ্ক রচিত হোক চিরকালের
আমি সেই চন্দ্রক্ষত নিয়ে একাই
চিতার ফাগুনে নাইতে যাব।' (তদেব, পৃ. ১৭)

কবির আরেকটি কবিতায় তাঁর কবিবন্ধু অমিতাভ দেবচৌধুরী[১৪] 'আবাহন কবিতা পড়ে তাঁর এক অক্ষম ভালোবাসার বয়ান। কবিতার নাম 'দেবী ফিরে আসবে'[১৫]।

— এই দেবীটি কে আসলে তা কবি এখানে উহ্য রেখেছেন। এই দেবী কি আসলে কবির প্রেমিকা? সে যাই হোক, কবিতায় কিন্তু মৃত্যু এবং প্রেম সঙ্গে এক করুণ সমর্পণ তিনটেই ফুটে উঠেছে। কবি লিখছেন—

'দেবী আর ফিরবে না
একটি অশ্রুত গানের খাঁজে খাঁজে
অন্ধকার টেবিলের স্বল্পায়িত চতুর্ভুজে
কাঠ আরও ঘন আধার হবে।

দেবী আর ফিরবে না

কাকে তুমি 'রাত থেকে কালো সুর' নিয়ে

মেয়ের ছায়ায় চুলে স্নানের সৌরভ ও স্বচ্ছতা দেবে কবি?

বরং ধরো দেখি একখানা জম্পেশ রামপ্রসাদী

পাহাড়ের পাদদেশ থেকে দুহাতে মেখে নেব

সহজ জীবন প্রণালি, তারপর রাতভর দুটিতে মিলে

'গান শুধু গান আর স্নান শুধু স্নান'।'

(তদেব, পৃ. ১৯)

এবার কবি বলছেন হৃদয় চিরে ডাক দিলেও দেবী আর ফিরবে না। এখানে প্রসঙ্গত 'তেরি কসম' সিনেমার কিশোকুমারের গলায় সেই বিখ্যাত গান—

'জিন্দেগি কে সফর গুজর যাতে হ্যায় যো মকাম

য়ো ফির নাহি আতে।'

— অর্থাৎ

জীবনের যে সময়গুলো পেরিয়ে যায় শত চেষ্টা করলেও হৃদয় নিংড়ে নিলেও তা আর ফিরে আসে না।

তবে কবি এখানে একটু শক্ত হয়েই বলে ওঠেন তাঁর দেবী যদি আর নাও ফেরে তবে।

'চলো বন্ধু, মাঝির ভাটিয়ালিতেই সহমরণ হোক

প্রথমবারের মতো ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়ে জ্বলে উঠুক চিতার আগুন

অভিজ্ঞান বড় হচ্ছে বয়েস বাড়ছে আমাদেরও

অথচ দেবীর কাছে এখনো কী করুণ সমর্পণ!' (তদেব, পৃ. ১৯)

কবি আবার বলছেন দেবী আর না ফিরলে কবি নিজেও অক্ষরহীনতায় শূন্য পাত্রটি শুধু হয়ে থাকবে। দেবী তাঁর কাছে ফিরুক আর নাই বা ফিরুক কোই বাত নেহি।

'দেবীরও বয়েস বাড়বে একদিন, লোলচর্ম বৃদ্ধা হবে,

কোনো প্রেমিক পুরুষ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না।

তখন শুধু আমি, এই আমি, তোমার পাশে এক অবোধবালক

ফিরে এসো দেবী

অক্ষরহীন মৃত্যু দিও না।'

কবির কবিতার সুর পালটে যায় 'চুম্বন টিপ'[১৬] কবিতায়। সেখানে চুম্বন থাকলেও তা যেন দহন যন্ত্রণার

সুখ।

'একদিন সবাই চলে যাবে যে যার পথে
সেই পোড়া গোধূলিতে, শুধু তুমি আর আমি,
ফিরে যাব সেইসব দিনগুলি, তোর কাছে
আমার সোনা মেয়েটিও ফিরবে পদ্মদাস কলোনি,
ফিরবে সবুজ জামা গায় এক অবাক সকাল।

দুহাতের আদরে গলা জড়িয়ে
সহাস্যে চুম্বন করোনি তো কখনো দেবী,
অথচ কত অক্ষৌহিণী চুম্বনে তছনছ করেছ
এই ক্ষণজীবন।
দহনেও এত পোড়া সুখ, আগুন কি তা জানে
— একটি তারা মোক্ষম চুম্বনটিপ, ওই কপালে।'

(তদেব, পৃ. ২১)

কবি বলছেন ভালোবাসায় মধুর রাতগুলো জানে কবি তাঁর প্রেমিকার কাছে কতটা ঋণী। তাই কবি বলছেন তিনি শুধু তারই আদর। তিনি নিজেও তারই। এই প্রেমিক কখনো লাফ দেয় না।

শুধু—

"ধীরে এসে দাঁড়ায় সামনে
তার ভালোবাসার কাছে।"

কবি সঞ্জয়ের 'রয়েছ নয়নে' কবিতায় একটু রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া আছে বলে মনে হয়। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে—

'ও মালিনী, কে তুমি, রচিছ মালাখানি
আজ বারি ঝরা আষাঢ় সন্ধ্যার ভরা ভাদরে!
সে কি তোমার চোখের জলের গানটি করে, একা, অন্দরে?
কোনো চন্দ্রিমার কামনা পিচ্ছিল আস্তানা নেই তো কোথাও
তাহলে একলা, একলাই চলো রে'

(তদেব, পৃ. ২৯)

কিন্তু কবিতার শেষের দিকে কবি আবার নিজের সুরে ফিরে আসেন—

'ওহে সমাধিফলক, বালিকাটি কেন টানে এত
বারংবার রিক্ত হয়েছি তোর পদাশ্রয়ে
বালিকা তার সমস্ত সৌরভ আমাকে বিলিয়ে নিজের
বসন্তটি করেছে শ্মশানভূমির মতো ছাইমথিত।
এত বেশি ভালোবাসা, ভালো নয়, ভয় করে।'

(তদেব, পৃ. ৩০)

কবি এবার জীবন নিয়েই মৃত্যু মুখের গান 'উৎপাত' করতে মুখর হয়েছেন। পাহাড় চূড়ার পদতলে জনজাতির গ্রামে কলস পূর্ণ মদিরা পান করবেন তিনি। কারণ তিনি তো যোগ্যতার ঘুড়ি নন যে আকাশ দাপিয়ে বেড়াবেন। তবু কেন মানুষেরা ভালোবেসে কষ্ট দিয়ে যায়! তাই কবি এবার—

'ভালোবাসা শব্দটিকে মদে চুবিয়ে গলায় ঢেলে দেব একদিন,
মেশায় টলতে টলতে খুঁজব ভালোবাসাকেই।
সে তখন আমার উদরে এক বিব্রত নিঃশরীর।'

(তদেব, পৃ. ৩০)

কবি সঞ্জয়ের আরেকটি কবিতা 'তোমাতেই বিলীন' যেখানে কবি প্রেমের সেই প্রাপ্তির টানে নিজের জীবনকে স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেলেছেন। সেই অনাবিল আনন্দে। প্রেমের মিলনের মধুর সময়গুলি প্রেমিক প্রেমিকার জীবনভরের সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায়। তাই কবি লেখেন—

'পরিমাণ মতো আলো দিলে,
আমি রয়ে যাব তোমার কাছে।
খুলে দেব লজ্জাকুন্তল, খুলে দেব তালা
শরীর ভরে এঁকে দেব রাশি রাশি তারা।
পরিমাণ মতো রাত্রি দিলে,
আমি রয়ে যাব তোমার কাছে।
তোমার বুকের জমাট মেঘে,
পালকের মতো নরম আদর
স্থাপন করবে ঠোঁট।
পরিমাণ মতো শ্রাবণ দিলে,
আমি তোমার পায়ের পাতার কাছে
রয়ে যাব বৃষ্টি কোলাহল মুখর।'

(তদেব, পৃ. ৪৫)

কবি বলছেন তিনি এখনই যাবেন না তিনি, শ্বেতপত্রে খোদাই করে রাখবেন বাংলা বর্ণমালা অক্ষম হস্ত বাটালিতে। কবিকে যে পথ দেওয়া হয়েছে সামান্য কবিজন্ম তো তারই পাদুকা আশ্রয়ে তাই—

'মৃত্যুর সঙ্গে কোনো বনিবনা নেই
শর্তহীন পাশে দাঁড়ালে
তোমাতেই বিলীন।'

কবি সঞ্জয়ের অন্য একটি কাব্যগ্রন্থ 'সঞ্জয় উদাস'[১৭] কবিতায় প্রেমটা শুধু ছুঁয়ে থাকা, এ কোনো শরীরী স্পর্শ নয়। তাই কবি লেখেন—

'সারদিন ছুঁয়ে রইলে আমায়, স্পর্শ করোনি তো একবারও
জীবনে ক্ষত এত, তোমার ছোঁয়ায় সকল চন্দন সুরভিত
এভাবেই ছুঁয়ে থাকো মৃত্যুরও ওপারে
ছুঁয়ে থাকা অবুঝ ভীষণ, সবাই কি পারে'

(সঞ্জয় উদাস, পৃ. ১২)

তাঁর অন্য একটি কবিতায় প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হওয়া এবং কথা হওয়া নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অজান্তেই এক মৃত্যু চেতনা কাজ করে গেছে। কিম্বা হয়তো সঞ্জয় যেন শুনেই এই চেতনাকে ধরে রেখেছেন—

'তোমার সঙ্গে কথা হবে না আর কোনোদিনও, কথা হবে রোজ
তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আর কোনোদিনও, দেখা হবে রোজ
আমি তো থাকব না একদিন, শ্রাবণমাখা যে পথ সর্বদা
আনন্দ লালন করে, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো তখন, সঞ্জয়ের কুশল।'

(তদেব, পৃ. ১৩)

— এই কবিতাটিতে কবি তাঁর প্রেমিকার কথা বলছেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে বাস্তবেরই সেই চিরন্তন সত্য বাণী, সেই মৃত্যুর বাণী। এখানে তিনি বলেছেন প্রেমের শুদ্ধতা মৃত্যুকেও জয় করে। তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে প্রতিদিন কথা বলা সম্ভব নাও হতে পারে। এমনিতে তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে চিরদিন না থাকাটাও সম্ভব হতে পারে। প্রেমের পথে যে আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দের ধারাও সময়ের সঙ্গে কমে যেতে পারে। কিন্তু চিরতরের জন্য সেই প্রেম বিলীন হয়ে যাবে না। কারণ শ্রাবণমাখা যে পথ আনন্দকে লালন করে কবি যে সে আনন্দেরই প্রতীক। তাই কবি নিজের নাম উল্লেখ করে বলছেন যে সঞ্জয়ের কুশল বার্তা নেবে সেই শ্রাবণমাখা আনন্দ ঘন পথ।

সঞ্জয় এমন একজন কবি যিনি তাঁর প্রেমিকাকে বাস্তবতার পথ দেখিয়েছেন ও সে পথে চলার জন্য মনে সাহস জুগিয়েছেন। জীবনের অন্তিম পর্যায় হল মৃত্যু সেই মৃত্যুর ফলে জীবনে ঢলে আসা দুঃখকে

জয় করার যে প্রচেষ্টা, তিনি সেই প্রচেষ্টার বীজ তাঁর প্রেমিকার মনে বপন করতে চেয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে যেন তাঁর প্রেমিকা ভেঙে না পড়ে সেই মনোবল গড়তে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে।

তাই তিনি বলছেন—

'আমার নিথর বুকের ওপর তোমার আছড়ে পড়া চলবে না
শরীরের প্রকোষ্ঠে যে অতীব নদী, তার জল রইল
মাঠ শস্যময় হবে, সুমঙ্গল ধ্বনিতে ভরে যাবে ঘরদুয়ার
চোখে তোমার রাখবে না জল, অশ্রু কুসুম আমার ভালো লাগে না।'

(তদেব, পৃ. ১৬)

কবির একটি মেয়েকে ভালোবাসেন। কিন্তু মেয়েটিকে যে ভালোবাসেন প্রস্তাব দিতে গেলে মেয়েটির উত্তর কী হতে পারে তাতে কবির সন্দেহ আছে। কবি ভেবে নিয়েছেন হয়তো-বা মেয়েটি বলবে নিশ্চয় তার কোনো সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক আছেই। যার সঙ্গে সারারাত সে না ঘুমিয়ে কথা বলে। তাই কবি লেখেন—

'আছে তো, সম্ভ্রান্ত থাকুক, আমার কী আসে যায়
আমার মুখাগ্নি হবে, মেয়েটির হিরণ্ময় মুদ্রায়'

(তদেব, পৃ. ১৯)

বস্তুত কবি বলতে চাইছেন মেয়েটি যদি সারাজীবন কবিকে ভালো না বাসেন তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যখন এই যাপনের নাম জীবন শেষ হবে এবং একদিন কবির মৃত্যু আসবে তখন অন্তত সেই মেয়েটির হাতেই যেন তাঁর মুখাগ্নি হয়। অন্তত শেষটায় কবি তাঁর ভালোবাসার পাত্রীকে পেতে চাইছেন প্রসঙ্গত এখানে অসমের বিখ্যাত নবপ্রজন্মের গায়ক জুবিন গার্গের "Gangstar"-এর সেই বিখ্যাত গান 'ইয়া আলি'র কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে নায়ক কিম্বা গায়ক গেয়ে ওঠেন—

'মিলে কুছ পল্ ও কুরবত কে
ফকির হম তেরি চাহত কে
রহে বেচেন দিল কব তক
মিলে কুছ পল তো রাহত কে
চাহত পে ইস্ক পে হা মিটা দু
লুটা দু ম্যায় অপনি খুনি'

— অর্থাৎ কবি যেমন চেয়েছেন তাঁর শেষ হোক তাঁর ভালোবার হাত ধরে, তেমনি এই গানটিতেও বলা হচ্ছে যে কিছুটা অন্তত শান্তি তো পাওয়া যাক প্রেমিকাকে ভালোবেসে। কতদিন আর মন অশান্ত থাকবে শেষমেশ প্রেমিকার জন্য ও প্রেমে নিজেকে শেষ করে দিয়ে খানিকটা শান্তি তো পাওয়া যাবে। (সঞ্জয় উদাস কবিতা সংখ্যা-১২)

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই মুহূর্তে খুব বেশি নারী কবিতা লিখছেন না। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে শিপ্রা দাস[১৮] এখন আর তত সৃষ্টিশীল নন। মহিলা কবি একটা লঘু তকমা। তবু বলতে যদি হয়, দীপিকা বিশ্বাসই সেই প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। এবং জয়িতা দাশ পুরকায়স্থের[১৯] কথাও উল্লেখ্য, তিনি সম্পাদনা করেন 'জললিপি'[২০] কবিতাপত্র। কয়েকটি ভালো কবিতা লিখে একেবারে থেমে গেছেন সম্ভাবনাময়ী জাহ্নবী দাশ।[২১] এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরীর[২২] কথা। 'ময়ুখ' পত্রিকা বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমাদের উপহার দেননি। একই গোত্রে ফেলা যাবে না রাধা দত্তকে।[২৩] কেননা তাঁর সম্পাদিত 'পূর্বদেশ গল্পপত্র'[২৪] শুধুই গল্পের পত্রিকা। এখন পর্যন্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে দীপিকার। 'আমাকে এভাবে ভাবো',[২৫] 'জীবন যার নাম'[২৬] ও 'আমি কোনদিন বিধবা হব না'[২৭]। দীপিকার কবিতায় বিশেষ বৈচিত্র্য নেই।

কবি লেখেন—

'বাড়ি ফিরে তুমি কার সাথে কথা বল
চোখ তুলে কাকে দেখাও অসীম ইচ্ছের দহন
কাকে দিতে চাও অকারণ বৃষ্টিপাত
হাতভরা সুখের সন্ধান...
কে তোমাকে দরজা থেকে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়
কে তোমাকে প্রতিদিন পুরনো হৃদয় খুলে
নতুন হৃদয় জুড়ে দেয়
কাকে তুমি ভালোবাসো আনত তৃষ্ণায়
সে কি কোনো বন্ধু?
কোনো অস্থির হাওয়ার ঝড়?
অথবা, আমি শূন্য ঘরের বিবর।'

(আমাকে এভাবে ভাবো, পৃ. ৭)

দীপিকার অন্য একটি কবিতার নাম 'রাত'। খুব সহজ-সরল ভাষায় তিনি প্রেমিককে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই কবি কিছুটা যৌনগন্ধী হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। তাই তিনি বলেন—

'তুমি এলে, রাত ভরে গেল পূর্ণ অন্ধকারে
দিনের আলোর আর প্রয়োজন রইল না।'

(তদেব, পৃ. ৮)

কবির প্রেমিক চলে গেলে তাঁর চোখ জলে ভরে যায় আর যখন সারারাত চোখের জল ঝরতে থাকে তখন দিনের আলো ঝপসা মনে হয়। তাই তিনি লেখেন—

"তুমি চলে গেলে

রাত বয়ে যায় চোখের জলে

দিনের আলোয় কিছুই আর চোখে পড়ে না।"

(দীপিকা বিশ্বাস, "আমাকে এভাবে ভাবো", কবিতা গ্রন্থ, পৃষ্ঠা নং ৮)

কবি 'কোলাহল' কবিতায় প্রেমিক দূরে থাকলে তাঁর চিন্তায় প্রিয়তমের জন্য যে ব্যাকুল মনোভাবের উদয় ঘটে সেই কথাই কবি এই কবিতাটিতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

'তুমি পাশে নেই

বিষাদের অন্যতম রূপান্তরে

সোজা হয়ে হাঁটে নিশাচর রাত

.....

তুমি পাশে নেই

অস্তিত্বের সংকটে

প্রাকৃতিক কোলাহল তীব্র হয়ে বাজে।'

(তদেব, পৃ. ১১)

'একা' কবিতাটিতে কবি তাঁর মনের অতলে যে একাকিত্ব লুকিয়ে রয়েছে তা তিনি নির্জনতায় বসে অনুভব করতে পারছেন। তাঁর চারপাশে লোকজনের কোলাহল থাকা সত্যেও তিনি মন থেকে একা হয়ে রয়েছেন। তাঁর এই উদাস ও একলা মনোভাবের যোগ্য প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে। তাই তিনি কবিতাটিতে বলেছেন—

'খুব নির্জনে বসে আছি একা

মানুষ আছে কাছেই

কাছের মানুষ নেই

তাই নির্জনতা।'

(তদেব, পৃ. ১৬)

কবি 'প্রহসন' কবিতাটিতে লিখেছেন রূপালি জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে যেতে স্বপ্ন কামনা করছিল কোনো স্বল্পবাস নারী। তারপর কবির ভাবনা এরকম—

'ভরা নদীর ভেতর ডুবে যাচ্ছিল পোড়া বাসর

এবং সমস্ত ইঙ্গিতপূর্ণ ভয়ের কুহেলি

সে তার পোশাক খুঁজে নিতে চেষ্টা করছিল

আলোয় দেখা সুতোর বুননে

শেষে আকাশটাই গায়ে জড়িয়ে গেল

আলোর ইতিহাস সহ অদ্ভুত প্রহসনে।'

(তদেব, পৃ. ১৮)

"আমি কখনও বিধবা হব না" কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা "আমাকে আঘাত কোরো না" কবিতায় কবি তাঁর প্রেমিককে বলছেন তিনি যেন তাঁকে আঘাত না করেন। কারণ বার বার আঘাত মেনে নেওয়ার জন্য তাঁর জন্ম নয়। এই প্রসঙ্গে কবি তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন—

'মা বলেছিল, যখন শব্দ আসে না

আকাশের দিকে চেয়ে গভীর প্রার্থনায়

অস্ফুট শব্দগুলি নিশ্চয়ই কথা হবে

মা বলেছিল অস্থির পথের ওপরই স্থিত থাকে

রোদ-ছায়া উল্লাসের বৃষ্টিধ্বনিগুলি

তুমি সেই অস্ফুট শব্দ গুলো মেলে দাও

রোদ্দুরের দিকে, আমাকে আঘাত কোরো না।'

(আমি কখনও বিধবা হব না, পৃ. ৭)

'চাঁদ ও শিশিরের স্বাদ' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়জন কোনো ব্যক্তিকে বলছেন ঘাসের ওপর না বসতে কারণ ঘাস ও শিশিরের মধ্যেকার প্রেম তিনি জানেন। ঘাস একাই শিশিরের সবটুকু বোধ বুকে পেতে নেয়। কবি মেঘের নীচেও বসতে বারণ করছেন কারণ মেঘরা শুধু বিদ্যুতের আলোক ঝলকানি দেখাবে। বস্তুত কবি প্রেমকে সমস্ত বোধ দিয়ে পেতে চলে। তিনি ফিরে যেতে চান না। তাই তিনি লেখেন—

'এখানে বোসো না কোনো নদীর কিনারে

তৃষ্ণার জল কখনো দেবে না সে

ফেরাবে হা-হৃদয় লবণাক্ত বোধ

এখানে চাঁদ ছায়া ফেলে কোথায় পালালে আজ

বজ্র-বিদ্যুৎ খোঁজে নদীতে পায়ের ছাপ

বৈদ্যুতিন আসবে তুমি কি পেয়েছ চাঁদ ও শিশিরের স্বাদ?'

(তদেব, পৃ. ১৫)

দীপিকা তাঁর আরেকটি কবিতা 'হেঁটে যাই'-তে বলছেন তাঁর মনের নিবিড় কলতানকে নদীর থেকে খুঁজে নিতে। পাখিকে বন্দি করে বোঝা যায় যে সে অকারণেই বন্দি হয়ে আছে অর্থাৎ ওড়াটাই তার

চিরন্তন অভ্যেস যেমনটা প্রেম মানুষের জীবনের এক চিরন্তন গতি। তারপর কবি বলেন—

'আমার ভেতরে দ্যাখো গহন চলাচল
দাসত্বের সর্বময় পরাধীনতায় উজ্জ্বল
চলো হাত ধরে হেঁটে আসি বনের ভেতর।
আমাকে প্রতিদিন বেদনার দিকে ঠেলে দাও
শরীরে ও মনে নীরবে নির্জনে
পাখিদের দিকে হেঁটে যাই...'

(তদেব, পৃ. ১৬)

"নদীর ফেরানো মুখ" কবিতায় দীপিকা একদম সম্পূর্ণ প্রেমিকা হয়ে উঠছেন। তিনি লিখছেন যে অনেক রাত হলে বোধহয় নদী জেগে উঠবে। কবির সঙ্গে কবির প্রেমিক গভীর কথায় ব্যস্ত হবে। আর তাই এই জন্যই একটা বই হাতে খেলার ঘরে ঢুকে রাত জাগেন দীপিকা। তারপর দীপিকা বলেন—

'কিন্তু এসএমএস-এ অন্য হাত এসে পৌঁছয়
বইয়ের ভেতরে সহবত মুড়ে খেলাঘরে মিশে যাই
নদীর ফেরানো মুখ টেনে নিয়ে যায় অতি-বসন্তে
ওরাও তোমার মতো হাসে, কাঁদে
এবং চলন্ত ট্রেনের দরজায় ছেড়ে দিয়ে চলে যায়
রাত ও বসন্তের বিরোধ আমি জেগে কাটাই সারারাত।'

(তদেব, পৃ. ২০)

দীপিকা বিশ্বাসের তৃতীয় বই 'জীবন যার নাম' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর অসুস্থ থাকাকালীন যে অভিজ্ঞতা তারই স্মৃতিচারণ। এত অসুস্থতার মধ্যেও প্রেম তাঁকে সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে গেছে। তাই কবির কলমে উছে এসেছে—

'একটা কচি বিড়াল থেমে ডাকছে
ওর ডাকে আমার ঘুম ভাঙেনি যদিও
ঠিক টের পেয়েছে আমি জেগেছি
.....
যদি সেসময় আশেপাশের কোনো ব্যালকনি থেকে
কোনো পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রেমিকের চোখ আগ্রহী হয়ে ওঠে
কীভাবে যুক্ত হবে ভাষার সংকেত।

.....

অরুণ, বন্ধু তুমি তো সহকর্মী নও শুধু, তুমি সহমর্মী

.....

আমি প্রেম খুঁজে নেব পঞ্চাশোর্ধ্ব সব যুবকের চোখে

জীবন হবে নতুন একেবারে কঠিনতম সময়ে।'

(জীবন যার নাম, পৃ. ২৮)

মারণরোগ ক্যানসারে যিনি ভুগছেন, সেই কবির মধ্যেও প্রেমের কী দারুণ প্রত্যাশা, কী চাহিদা।

আবার কখনো দীপিকা হাসপাতালের বেডে প্রেমের আভাস পান কোনো এক বৃদ্ধের কাছে। যে বৃদ্ধ শীতের রাতে কবিকে আচমকা মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে দেন। কবি নিজেকে 'তরুণ বৃদ্ধা'[২৮] বলছেন। তারপর কবির বয়ান—

'আমাকে জাগাতে চায় কোন এক বৃদ্ধ যুবক

আমাকে ঠায় বসিয়ে রাখতে চায়

মোহময় রাতের ভাষায়

সদ্য কর্কট আরোগ্য আমার গলা

.....

আমাকে হাঁটি হাঁটি পা পা প্রেমে শেখায়

দৌড়ে আমি এক যুবক বৃদ্ধের সঙ্গে

.....

কৃষ্ণ রুক্মিণী আমার আদর্শ হয়ে ওঠে

আমি লীলাবতী মেঘের মতো আকাশ জুড়ে ছুটি।'

(তদেব, পৃ. ৩০)

কখনো আবার এই প্রেমিক কবি নিজে তাঁর বন্ধুকে অবসর বিনোদনের জন্যে ডাকেন এভাবে—

বন্ধু এসো, আমাকে দিয়ে যাও গল্প-অবসর

দিয়ে যাও সূর্য অস্তাচল, অন্ধকার রাত আর নির্জন বাসর

.....

আরও অজাগতিক অন্য এক মোহময়তার মধ্যে

মাঝে মাঝে এক মোহনবাঁশির শব্দ হতে থাকে

.....

অমূল্য দানে পেয়েছি এই জীবন

গল্পে গল্পে আনন্দে কোলাহলে করো অমৃত মন্থন।

এভাবে ব্রহ্মপুত্র পারের কবি দীপিকা বিশ্বাস তাঁর কবিতায় প্রেমকে বুনে যান এখন পর্যন্ত।

অন্যদিকে বরাক দুহিতা স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের[৩০] কবিতায় কান পাতলে ধ্বনিত হয়—

'শব্দ আর

শব্দের শবের ওপর

শুয়ে আছে কবি

নির্মোহ, বীতিশোক।

তার নিজেকে ভাঙা শেষ

তার নিজেকে গড়া অসম্ভব।'

তাঁর নির্মেদ লেখায় অনিবার্য, অমোঘ ঝড় স্পষ্ট উঠে আসে জননীর মাঝে। মানবী সত্তাটি বড় সুন্দর তুলে আনেন স্বর্ণালী—

'তবু নিশ্চয় জানি

সিঁদুর টিপের কাছে

ত্রিনয়ন লুকানো রয়েছে।

আসলে ঈশ্বরী তুমি

ভালোবেসে হয়েছ জননী।'

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৬৩)

কবি স্বর্ণালীর রোমান্টিসিজম ছুঁয়ে শুনি—

'রাত্রির উপকূলে

জ্যোৎস্নার রুপোলি বন্দর

বিছানা-জাহাজ থেকে দেখা যায়

নীল সমুদ্দুর।

সমস্ত আকাশ জুড়ে

মোহনায় আমাতে তোমাতে

একটি দীঘল সেতু

গড়া যায়, অন্তহীন রাতে।'

(তদেব, পৃ. ৩৬৩)

আবার কখনো কবির কলমে উঠে আসে—

'সহজ ব্যঞ্জনে তুমি

হলুদের বর্ণ নিয়ে আসে

পরিচিত রান্নাঘরে

.....

তোমার লাবণ্যে সখি

সাদা ভাত বর্ণ পায়

বন্ধ ঘর আলো হয়ে হাসে।'

স্বর্ণালীও কিছুটা জীবনানন্দীয় ঢঙে কবিতার নাম রাখেন 'সুজাতা'।[৩১] আর কবিতার আঙ্গিকে বোধবৃক্ষের প্রসঙ্গ উঠে আসে এভাবে—

সহজ আঙুলে ধরা পাত্রভরা পরমান্ন দেখে

তথাগত হয়ে গেলে তুমি

—মিষ্টি এক প্রেমিকার কথা।

তারপর,

এবার বৃষ্টি হোক, ঝরে পড়া বোধবৃক্ষ থেকে

কোন এক সমগ্রতা আচ্ছন্ন করেছে ভূমি

এই ভোর হয়।

— এখানে জীবনানন্দের স্বাদ প্রায় পুরোটাই উঠে এসেছে।

আবার সুজাতা-য় সুরঞ্জনা বা সুচতেনার মতো সুজাতা নামটাই উঠে আসে। 'কার্তিকের রাত,' 'নবান্নের ভাত'[৩২]— এই সমস্ত শব্দগুলোই জীবনানন্দের কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবি লিখছেন—

"আকাশের গাল বেয়ে

ক্ষমার মতন বৃষ্টি ঝরে

.....

সুজাতা আগামী জন্মে

আমি হবো কার্তিকের রাত

.....

তুমি হয়ো

নবান্নের ভাত।"

(সুজাতা-২, স্বর্ণালী বিশ্বাস)

কখনো-বা কবি স্বর্ণালী আবার সরাসরি 'অভিসার'[৩৩] নাম দিয়েই কবিতা লিখছেন—

আজ যাবো না নদীর কাছে
আজ যাবো না জলে
আমি কেবল বৃষ্টিধারা
ছুঁইয়েছি দুই গালে।
আগল খুলে বাইরে এলাম
চোখ ডুবে যায় ঘাসে
আমি কেবল মধ্যাচারী
ঘরে ও সন্ন্যাসে
.....
কোথায় আমার মাধুকরী?
কোথায় আমার ঘর?

আবার স্বর্ণালী লিখেছেন 'বর্ষামঙ্গল'[৩৪]। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার নাম 'বর্ষামঙ্গল'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল আর স্বর্ণালীর বর্ষামঙ্গলে কোনো মিল নেই। স্বর্ণালী লিখছেন এভাবে—

লিখবো বর্ষার কাব্য, আমার গর্ভের মাঝে
হলো যার চেতনা সঞ্চার,
লিখবো বর্ষার কথা, আমার অশ্রুর মাঝে
ছিলো যার জন্মগত ভ্রূণ,
.....
লিখবো বর্ষার কথা, অসহ চুম্বনে যার
দগ্ধ হয়ে অদ্যাবধি।

স্বর্ণালীর 'হসপিটাল'[৩৫] কবিতায় প্রেমিক পুরুষের কাছে তাঁর অসুখ শুষে নেওয়ার কায়দাটাও মন কাড়ে পাঠকের।

'একটি চুম্বনে তুমি শুষে নাও সকল অসুখ
এ ঠোঁট ক্লান্ত আজ তিক্ত স্বাদ অ্যান্টিবায়োটিক
জরা ও বিষণ্ণ বড় রক্তাল্প সঙ্গীহীন একা
তোমার দুঠোঁট যদি সঙ্গী হয় আজ দ্বিপ্রহরে

হয়তো সে ফিরে পাবে তার রং, মেলে দেবে পাখা...'

(অ-কবিতা, পৃ. ২৭)

স্বর্ণালী মানুষী প্রেম থেকে কখনো আবার তাঁর কলম ফিরিয়েছে 'পূর্বরাগ'[৩৬]-এর দিকে। আমরা জানি 'পূর্বরাগ' 'বৈষ্ণব পদাবলী'র[৩৭] একটি অন্যতম পর্যায়। তবে স্বর্ণালীর পূর্বরাগ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে প্রেমের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিপার্শ্বিকতাও দেখা যায়। স্বর্ণালী 'পূর্বরাগ' নামের কবিতায় লিখছেন—

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে মেঘ ভেসে এল

শিলং পাহাড়ে,

ওই মেঘ চন্দ্রাবলী, ওই মেঘ বিশাখা, ললিতা—

.....

তাই ঝমঝম বৃষ্টি বুঝি নামে

লাবান বাজারে।

আর এক ভীরু মেঘ আর এক ধবল কিশোরী

আজ তার অভিসার

.....

শিলং পাহাড়ে আজ পূর্বরাগ অভিনীত হবে।

বরাকের জনপ্রিয় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী।[৩৮] বাস্তবমুখী হয়েও অসাধারণ রোমান্টিক। প্রেমের প্রভাব থেকে তিনিও মুক্তি পাননি। তাঁর কবিতায় কান পাতলে শুনি—

'তুমি আমার ঘুম ডাকা ভোর বাউল কণ্ঠে 'রাই জাগো' গান

তুমি আমার খয়রাতী দান রেশন-চালের পাথরকুচি

দূর বিদেশে তুমি আমার খাল পেরোতে ভাঙা সাঁকো

তুমি আমার ঘুষঘুষে জ্বর নতুন জুতোর দুঃখ ও সুখ

ওপর আলোর খুশি মেজাজ তুমি আমার তুমি আমার।'

(বাংলা কবিতাচর্চার রূপরেখা, পৃ. ৩৫৯)

জীবনকে এমন করে দেখার এই বিপ্রতীপ প্রয়াস বরাক উপত্যকায় একেবারেই নতুন আর এই নতুনত্বে জড়িয়ে থাকা তির্যক বাচনভঙ্গিও আধুনিকও। তাঁর ছন্দজ্ঞান অপরিসীম।

'অতন্দ্র'[৩৯] থেকে তাঁর জয়যাত্রা শুরু, ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত এ উপত্যকার ছোট পত্রপত্রিকায় শক্তিপদ ব্রহ্মচারী কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর 'মনসামঙ্গল'[৪০] কবিতাটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বরাক উপত্যকা এবং বহির্বঙ্গেও। লোকায়ত জীবনের ঐতিহ্য নিয়ে। 'মনসামঙ্গল'-এ কবি লিখেছেন— 'কুপি লম্পে রাতকানা নিরক্ষর বুড়ি'র মানবিক করুণ ছবি—

'সপ্তডিঙা মধুকর চারদিকে জল
শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসা মঙ্গল
পচাপাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা
ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রণা
হু হু করা কাল সন্ধ্যা ভেসে আসা গানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে'

(তদেব, পৃ. ৩৫৯)

কবির আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেমের কবিতা হল 'মা বলতে পারতেন।'[৪১] এখানে কবি প্রেমের এক অব্যক্ত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তিনি শুধু প্রেম নয়, মায়ের মমতাকেও একসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। তাই বলে এখানে মায়ের তার সন্তানের প্রতি যে প্রেম তা বিন্দুমাত্র লোপ পায়নি। তাই কবি বলছেন—

'কীসব ছাইপাঁশ লিখে যাস, মানুষের কী যে কাজে আসে
বুঝি না কিছুই, দেখি কলমের শিস মুখে, আর মাঝে মাঝে
বিড়বিড় করিস শব্দ শব্দ শব্দ ব্রহ্ম চারিদিকে শব্দের জঞ্জাল
অর্থহীন বাক্যমালা তোকে শব্দ খুবলে খেয়ে যাবে।
.....
যে মেয়েটি রোজ আসত তোর কাছে এখন কোথায়
তার বিয়ে হয়ে গেছে? ভালো ঘর, ভালো বর, জানিস তো ঠিক
সবাই থাকুক ভালো, চারিদিক শান্ত স্নিগ্ধ চোখ
আলো নিয়ে জেগে থাক, শস্যদানা খুঁটে নিবি তুই

আমার বুকের দুধে তোর মুখ বারবার ধুয়ে দেবো আয়।'

(উত্তর পূর্বের বাংলা কবিতা, পৃ. ৬৪)

সময়টা ষাটের দশক। কবিদের ঘিরে ছিল অস্থিরতা সেই সময়। মেধা বা মনন জীবন সত্য খুঁজতে আঞ্চলিকতা তখন উড়াল পাখি বৃহত্তর বাংলা কাব্য ও সাহিত্য আকাশে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাকে গুরুত্ব না দিয়ে মূলস্রোতে বয়ে যাওয়ার জন্য হৃদয় ও কলম তীব্র তৃষ্ণায় কাজ করে চলেছে। নির্দ্বিধায় বলা যায় অতন্দ্রকে কেন্দ্র করেই তখন এক কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এ ছাড়া শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি থেকে প্রচুর ছোট পত্রিকা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল— তাদেব কেউ কেউ দীর্ঘজীবী বা ক্ষণজীবী হলেও কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতে জেগে থাকলো সময় ও জীবনের মূল্যবান গাথা। বলা

যায় এই সব ছোট পত্রিকা সময়ের এক মূল্যবান দলিলও বটে। এই সকল কবিদের মধ্যে কেউ কেউ বাস্তবজীবনের চূড়ান্ত চাহিদায় পা বাড়িয়েছেন দূর দেশে, ক্রমশ সেই সব নাগরিক জীবন ও ক্ষেত্রে ছড়িয়ে গেছে তাঁদের শেকড়।

পরবর্তী পর্যায়ে আসেন আলোকিত লণ্ঠন জ্বালিয়ে কাব্যলক্ষ্মীর আরো সন্তানসন্ততি। 'কবি-বংশে'র বুদ্ধি ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম একজন অমিতাভ দেব চৌধুরী।

অমিতাভ প্রেমের কবিতা ঠিক সে অর্থে লেখেননি। কিন্তু কবিতায় প্রেম একেবারেই থাকবে না তা কী করেই বা সম্ভব? কবির অজান্তেই হয়তো প্রেম এসে কবিতায় একাকার হয়ে যায়, তবে প্রেমের কবিতাই লিখব, এমন কোনো শর্ত মাথায় নিয়ে অন্তত অমিতাভ কবিতা লেখেননি বললে হয়তো ভুল হবে না।

অমিতাভ লেখেন—

যত কথা বলি আর যত কথা লিখি
সেসব কথারা যদি হারিয়ে সকল অর্থ

যে কথা বলিনি কোনোদিন, কোনোদিন যে কথা লিখি
... ...
যদি তুমি নেচে ওঠ গানের সে
হরভিসন্ধিতে
এইটুকু অভিপ্রায়। (ঘুঙুর)

কবি ঘুঙুরের কথা বলতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কোনো কাউকে আকাঙক্ষা করছেন সেই ঘুঙুরের অধিকারী হওয়ার।

আবার যখন 'সেলুনে রবীন্দ্রগীতি'[৪২] কবি লেখেন, তখন রবীন্দ্রগীতির প্রসঙ্গে সখি বা বসন্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। যা কি না প্রেমেরই অনুষঙ্গ। কবি লিখছেন—

'সেলুনে শুনেছি গান, অকস্মাৎ রেডিওর
বিষণ্ণ গলায়
চলে যায়, চলে যায় বসন্তের দিন চলে
যায়...
কী গান শোনালে সখি, আয়নায় স্তব্ধ হয়ে
দেখি
... ...
অনন্ত বসন্তদিন, আমি গান হয়ে যাই

সেলুনের একা আয়নায়।'

'মৈষাল'[৪৩] কবিতায় কবি মূলত স্থানিকতার সঙ্গে প্রেমকে এনেছেন—

গান শুনে চোখে জল আসে
মনে পড়ে, বহুজন্ম আগে আমি মৈষাল
ছিলাম।
... ...
আমি নারীদের কাম
... ...
গোয়ালপাড়ার থেকে ফিরে আসি গহন আসাম।
একজন নারী শুধু আমার আগুন
দিয়েছিল একাকী নিভিয়ে,
বলেছিল, সম্ভোগের চেয়ে মুখোমুখি বসে
থাকা
ঢের বেশি দামি।
... ...
এ জন্মেও হে সুন্দরী, তোমার শহর জুড়ে
ফেরি করি সুরের সে গ্রাম।

আবার নিছক প্রেমই ফুটে উঠেছে এমন কবিতাও রয়েছে অমিতাভের হাতে।

তোমার বাড়ির আপনভোলা রোদ
আমার ঘরের দাওয়ায় আসতো না।
বাড়ি দুটির মাঝখানে যে ছিল
গাছের বেড়া, ছায়ার আস্তানা
... ...
রোদ হয়েছে সেলাই— তা তো ঠিক
ছায়ার এখন কমছে আনাগোনা।
রোদ আসে আজ। কিন্তু তোমার দূত
একলা শালিখ, সে আর আসে না।

আমরা জানি এক সময় পায়রা চিঠি আদান প্রদান করত। কাজেই তাকে দূত বলা হয়। কিন্তু কবি অনেকটা যেন জীবনানন্দীয় ঢঙে শালিখকে তাঁর প্রেমিকার দূত বলেছেন অবলীলাক্রমে।

আবার কখনও খুব ছোট্ট করে আদান প্রদানের কথা লেখেন কবি এভাবে—

সাজানো বাগান সব কথা ভুলে গেলে
মরুভূমি কিছু কিছু কথা তুলে নেয়।
পড়ে থাকে শুধু চাষ আবাদের কথা
আদান প্রদান এভাবেই শেষ হয়।

এভাবেই অমিতাভ দেবচৌধুরির কবিতায় প্রেম খেলা করে যায়।

বস্তুত, ব্রহ্মপুত্র বা বরাক কিংবা পৃথিবীর যে কোনো স্থানের কবিতাই হোক না কেন, প্রেম স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির কলমে উঠে আসে। জীবনানন্দের ভাষায় 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'। আর যাঁরা যথার্থ অর্থে কবি তাঁরা প্রেমিক না হয়ে কবিতা লিখতে পারেন না। তবে হ্যাঁ কেউ একেবারে রগরগে প্রেম কিংবা যৌনতার কবিতাও লেখেন। তবে আমরা সে আলোচনায় যাব না। আমাদের আলোচ্য বিষয় অসমের বাংলা কবিতায় প্রেম। সেটাতে ব্রহ্মপুত্রও বরাক দুই উপত্যকায় সমান কৃতিত্ব দাবি করে বলে মনে হয়।

তথ্যসূত্র

১. দেশভাগ — প্রথমে ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান ভাগ হলো। তখন বহু বাঙালি অসমে এসেছে। তারপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হয়ে যাওয়ায় কাতারে কাতারে বাঙালি অসমে বসতি স্থাপন করেছে। তার যে ঘাত প্রতিঘাত তা কবিদের কলমে এসেছে।

২. উদ্বাস্তু চেতনা— দেশভাগের ফলে যারা ভারতে বিশেষত অসমে বসতি স্থাপন করেছে। সেই ভিটে মাটি হারা মানুষগুলোর যে মানসিক চেতনা তাকেই উদ্বাস্তু চেতনা বলা হয়েছে।

৩. ভাষা আন্দোলন— ১৯৬১ সালে বাংলা ভাষা রক্ষার তাগিদে বরাক উপত্যকায় যে আন্দোলন হয়েছিল।

৪. স্থানিকতা— যে সব কবিতায় স্থান-নাম দিয়ে কবিরা নিজেদের অস্তিত্বকে প্রতিপন্ন করেছেন।

৫. আমাকে এভাবে ভাবো— কবি দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।

৬. দীপিকা বিশ্বাস— দীপিকা বিশ্বাস ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য প্রেম। প্রেম সঞ্জীবনী শক্তির মতো মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকেও ফিরিয়ে আনতে পাবে, এমনটাই বিশ্বাস এই কবির।

৭. শক্তিপদ ব্রহ্মচারী— বরাক উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি। শক্তিপদ ব্রহ্মচারীকে বাদ দিয়ে বরাকের তথা অসমের বাংলা কবিতাকে চিন্তাই করা যায় না বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

৮. সঞ্জয় চক্রবর্তী— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার একজন বিশিষ্ট কবি। আশির শেষ আর নয়ের দশকের শুরুতে তাঁর কাব্যচর্চা শুরু হয়। সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে।

৯. তরঙ্গতাড়িত— সঞ্জয় চক্রবর্তীর প্রথম কবিতার বই। প্রকাশকাল ১৯৯৮ সাল।

১০. মহাবাহু — একটি ছোট পত্রিকা। যার সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লাহিড়ী।

১১. কুয়াশালিপি— সঞ্জয় চক্রবর্তীর বই।

১২. সরস্বতী পুজোর মেয়ে— সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতার নাম।

১৩. বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে — ইংরেজি 'ভ্যালেন্টাইন ডে' হল ১৪ ফেব্রুয়ারি। 'ভ্যালেন্টাইন ডে' মানে প্রেমের দিন। আর বাঙালির 'ভ্যালেন্টাইন ডে' সঞ্জয় চক্রবর্তীর ভাষায় সরস্বতী পুজোর দিন।

১৪. অমিতাভ দেব চৌধুরী— বরাক উপত্যকার অন্যতম শক্তিমান কবি। পেশায় শিক্ষক। কবিতায় এক অন্য মাত্রার স্বাদ এনেছেন তিনি।

১৫. দেবী ফিরে আসবে— সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতা।

১৬. চুম্বন টিপ— কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতা।

১৭. সঞ্জয় উদাস— কবি সঞ্জয় চক্রবর্তীর কবিতার বই।

১৮. শিপ্রা দাস — ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রথম মহিলা কবি। তাঁর একটি মাত্র কবিতার বই 'নস্টালজিয়া'।

১৯. জয়িতা দাশ পুরস্কায়স্থ — ব্রহ্মপুত্রপারের একজন বিশিষ্ট মহিলা কবি। 'জললিপি' কবিতাপত্রের সম্পাদক।

২০. জললিপি — জয়িতা দাশ পুরকায়স্থের সম্পাদিত কবিতাপত্র।

২১. জাহ্নবী দাশ— ব্রহ্মপুত্র পারের কবি। খুব কম কবিতা লিখে তিনি থেমে যান। তাঁর কোনো

কবিতার বই এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। 'মে'খানা' কবিতাপত্রের অন্যতম সম্পাদক।

২২. মৈত্রেয়ী রায়চৌধুরী — 'ময়ূখ' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। যা বর্তমানে লুপ্ত। উল্লেখ্য পত্রিকাটি গৌরীপুর থেকে প্রকাশিত হত।

২৩. রাধা দত্ত — 'পূর্বদেশ' নামক 'গল্পপত্র'-এর সম্পাদক।

২৪. পূর্বদেশ গল্পপত্র — অখিল দত্ত সম্পাদিত গল্প পত্রিকা। অখিল দত্তের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন রাধা দত্ত।

২৫. আমাকে এভাবে ভাবো— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।

২৬. 'আমি কোনদিন বিধবা হব না'— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।

২৭. জীবন যার নাম— দীপিকা বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ।

২৮. 'তরুণ বৃদ্ধা'— কবি দীপিকা বিশ্বাস নিজেকে কবিতায় এই নামকরণ করেছেন।

২৯. 'পঞ্চাশ পার হয়ে' — দীপিকা বিশ্বাসের কবিতার নাম।

৩০. স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য — স্বণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্য বরাকদুহিতা ও শিলঙের বধূ। নারী স্বাধীনতা তাঁর কবিতার মূল উপজীব্য। তবে কখনো কখনো প্রেমও তাঁর কবিতায় করা পড়েছে। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'অ-কবিতা'।

৩১. সুজাতা— স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের কবিতার নাম।

৩২. নবান্নের ভাত — পৌষ মাসে যে নবান্ন উৎসব বাংলাদেশে হতো তারই আমেজ পাওয়া যায় কবি স্বর্ণালীর কবিতাতেও।

৩৩. অভিসার— স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের কবিতার নাম।

৩৪. 'বর্ষামঙ্গল— স্বর্ণালী বিশ্বাস ভট্টাচার্যের কবিতার নাম।

৩৫. হসপিটাল— কবি স্বর্ণালীর কবিতার নাম।

৩৬. পূর্বরাগ— বৈষ্ণব পদাবলির এক অন্যতম পর্যায়। কবি স্বর্ণালীও পূর্বরাগ নামে কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতাতে কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলির ছোঁয়া।

৩৭. বৈষ্ণব পদাবলি— মধ্যযুগের রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত চৈতন্যের যে দর্শন তা-ই বৈষ্ণব পদাবলি। বৈষ্ণব পদাবলি মূলত চারভাগে বিভক্ত— ১) পূর্বরাগ ২) অভিসার ৩) মাথুর ও ৪) ভাবসম্মিলন।

৩৮. শক্তিপদ ব্রহ্মচারী— বরাক উপত্যকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

৩৯. অতন্দ্র— বরাক উপত্যকা থেকে প্রকাশিত একটি ছোট পত্রিকা। অধুনালুপ্ত। এই পত্রিকা ঘিরে বরাকের একটা কাব্য-আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল।

৪০. মনসামঙ্গল— বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের অন্যতম। তবে এই 'মনসামঙ্গল' নাম দিয়ে কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী একটি অসাধারণ কবিতা লিখেছেন।

৪১. মা বলতে পারতেন— কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর একটি কবিতার নাম।

৪২. সেলুনে রবীন্দ্রগীতি— কবি অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতার নাম।

৪৩. মৈষাল — কবি অমিতাভ দেব চৌধুরীর কবিতার নাম।